৮

স্থান -- আলমবাজার
কাল -- মে, ১৮৯৭

দার্জিলিঙ হইতে স্বামীজী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। আলমবাজার মঠেই অবস্থান করিতেছেন। গঙ্গাতীরে কোন স্থানে মঠ উঠাইয়া লইবার জল্পনা হইতেছে। শিষ্য আজকাল প্রায়ই মঠে তাঁহার নিকটে যাতায়াত করে এবং মধ্যে মধ্যে রাত্রিতে অবস্থানও করিয়া থাকে। দীক্ষাগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শিষ্য স্বামীজীকে দার্জিলিঙে ইতঃপূর্বে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিল। স্বামীজী তদুত্তরে লিখেন, নাগ-মশায়ের আপত্তি না হলে তোমাকে অতি আনন্দের সহিত দীক্ষিত করব।

১৩০৩ সালের ১৯ বৈশাখ। স্বামীজী আজ শিষ্যকে দীক্ষা দিবেন বলিয়াছেন। আজ শিষ্যের জীবনে সর্বাপেক্ষা বিশেষ দিন। শিষ্য প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানান্তে কতকগুলি লিচু ও অন্য দ্রব্যাদি কিনিয়া বেলা ৮টা আন্দাজ আলমবাজার মঠে উপস্থিত হইয়াছে। শিষ্যকে দেখিয়া স্বামীজী রহস্য করিয়া বলিলেন, আজ তোকে 'বলি' দিতে হবে -- না?

স্বামীজী শিষ্যকে ঐ কথা বলিয়া আবার হাস্যমুখে সকলের সঙ্গে আমেরিকার নানা প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। ধর্মজীবন গঠন করিতে হইলে কিরূপ একনিষ্ঠ হইতে হয়, গুরুতে কিরূপ অচল বিশ্বাস ও দৃঢ় ভক্তিভাব রাখিতে হয়, গুরুবাক্যে কিরূপ আস্থা স্থাপন করিতে হয় এবং গুরুর জন্য কিরূপে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইতে হয় -- এ-সকল প্রসঙ্গও সঙ্গে সঙ্গে হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি শিষ্যকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া তাহার হৃদয় পরীক্ষা করিতে লাগিলেন: আমি তোকে যখন যে কাজ করতে বলব, তখনি তা যথাসাধ্য করবি তো? যদি গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে বা ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পৃলে তোর মঙ্গল হবে বুঝে তাই করতে বলি, তা হলেও তাও নির্বিচারে করতে পারবি তো? এখনও ভেবে দেখ; নতুবা সহসা গুরু বলে গ্রহণ করতে এগোসনি। এইরূপে কয়েকটি প্রশন করিয়া স্বামীজী শিষ্যের বিশ্বাসের দৌড়টা বুঝিতে লাগিলেন। শিষ্যও নতশিরে 'পারিব' বলিয়া প্রতি প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল।

স্বামীজী -- যিনি এই সংসার মায়ার পারে নিয়ে যান, যিনি কৃপা করে সমস্ত মানসিক আধিব্যাধি বিনষ্ট করেন, তিনিই যথার্থ গুরু। আগে শিষ্যেরা 'সমিৎপাণি' হয়ে গুরুর আশ্রমে যেত। গুরু -- অধিকারী বলে বুঝলে তাকে দীক্ষিত করে বেদপাঠ করাতেন এবং কায়মনোবাক্যদন্ড-রূপ ব্রতের চিহ্নস্বরূপ ত্রিরাবৃত্ত মৌঞ্জিমেখলা তার কোমরে বেঁধে দিতেন। ঐটে দিয়ে শিষ্যেরা কৌপীন এঁটে বেঁধে দিতেন। সেই মৌঞ্জিমেখলার স্থানে পরে যজ্ঞসূত্র বা পৈতে পরার পদ্ধতি হয়।

শিষ্য -- তবে কি, মহাশয়, আমাদের মতো সুতার পৈতা পরাটা বৈদিক প্রথা নয়?

স্বামীজী -- বেদে কোথাও সুতোর পৈতের কথা নেই। স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দনও লিখেছেন, 'অস্মিন্নেব সময়ে যজ্ঞসূত্রং পরিধাপয়েৎ।' সুতোর পৈতের কথা গোভিল গৃহ্যসূত্রেও নেই। গুরুসমীপে এই প্রথম বৈদিক সংস্কারই শাস্ত্রে 'উপনয়ন' বলে উক্ত হয়েছে। কিন্তু আজকাল দেশের কি দুরবস্থাই না হয়েছে। শাস্ত্রপথ পরিত্যাগ করে কেবল কতকগুলো দেশাচার, লোকাচার ও স্ত্রী-আচারে দেশটা ছেয়ে খেলেছে। তাই তো তোদের বলি, তোরা প্রাচীন কালের মতো শাস্ত্রপথ ধরে চল। নিজেরা শ্রদ্ধাবান হয়ে দেশে শ্রদ্ধা নিয়ে আয়। নচিকেতার মতো শ্রদ্ধা হৃদয়ে আন। নচিকেতার মতো যমলোকে চলে যা -- আত্মতত্ত্ব জানবার জন্য, আত্ম-উদ্ধারের জন্য, এই জন্মমরণ-প্রহেলিকার যথার্থ মীমাংসার জন্য যমের মুখে গেলে যদি সত্যলাভ হয়, তা হলে নির্ভীক হৃদয়ে যমের মুখে যেতে হবে। ভয়ই তো মৃত্যু। ভয়ের পরপারে যেতে হবে। আজ থেকে ভয়শূন্য হ। যা চলে -- আপনার মোক্ষ ও পরার্থে দেহ দিতে। কি

হবে কতকগুলো হাড়-মাংসের বোঝা বয়ে? ঈশ্বরার্থে সর্বস্বত্যাগ-রূপ মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করে দধিচি মুনির মতো পরার্থে হাড়মাংস দান কর। শাস্ত্রে বলে -- যাঁরা অধীত-বেদবেদান্ত, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ, যাঁরা অপরকে অভয়ের পারে নিতে সমর্থ, তাঁরাই যথার্থ গুরু; তাঁদের পেলেই দীক্ষিত হবে -- 'নাত্র কার্যবিচারণা'। এখন সেটা কেমন দাঁড়িয়েছে জানিস -- 'অন্ধেনৈব নীয়মামা যথান্ধাঃ।'[১]

বেলা প্রায় নয়টা হইয়াছে। স্বামীজী আজ গঙ্গায় না গিয়া ঘরেই স্নান করিলেন। স্নানান্তে নূতন একখানি গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া মৃদুপদে ঠাকুরঘরে প্রবেশপূর্বক পূজার আসনে উপবেশন করিলেন। শিষ্য ঠাকুরঘরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিল; স্বামীজী ডাকিলে তবে ঝাইবে। এইবার স্বামীজী ধ্যানস্থ হইলেন -- মুক্তপদ্মাসন, ঈষন্মদ্রিতনয়ন, যেন দেহমনপ্রাণ সকল স্পন্দহীন হইয়া গিয়াছে। ধ্যানান্তে স্বামীজী শিষ্যকে 'বাবা, আয়' বলিয়া ডাকিলেন। শিষ্য স্বামীজীর সস্নেহ আহ্বানে মুগ্ধ হইয়া যন্ত্রবৎ ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল। ঠাকুরঘরে প্রবেশমাত্র স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, দোরে খিল দে। সেইরূপ করা হইলে বলিলেন, স্থির হয়ে আমার বাম পাশে বোস। স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া শিষ্য আসনে উপবেশন করিল। তাহার হৃৎপিন্ড তখন কি এক অনির্বচনীয় অপূর্বভাবে দুরদুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অনন্তর স্বামীজী তাঁহার পদ্মহস্ত শিষ্যের মস্তকে স্থাপন করিয়া শিষ্যকে কয়েকটি গুহ্য কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শিষ্য ঐ বিষয়ের যথাসাধ্য উত্তর দিলে পর মহাবীজমন্ত্র তাহার কর্ণমূলে তিনবার উচ্চারণ করিলেন এবং পরে শিষ্যকে তিনবার উহা উচ্চারণ করিতে বলিলেন। অনন্তর সাধনা সম্বন্ধে সামান্য উপদেশ প্রদান করিয়া স্থির হইয়া অনিমেষনয়নে শিষ্যের নয়নপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। ... কতক্ষণ এভাবে কাটিল, শিষ্য তাহা বুঝিতে পারিল না। অনন্তর স্বামীজী বলিলেন, গুরুদক্ষিণা দে। শিষ্য বলিল, কি দিব? শুনিয়া স্বামীজী অনুমতি করিলেন, যা, ভান্ডার থেকে কোন ফল নিয়ে আয়। শিষ্য দৌড়িয়া ভান্ডারে গেল এবং ১০।১৫টা লিচু লইয়া পুনরায় ঠাকুরঘরে আসিল। স্বামীজীর হস্তে দিবামাত্র তিনি একটি একটি করিয়া সেগুলি সব খাইয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, যা, তোর গুরুদক্ষিনা দেওয়া হয়ে গেল।

দীক্ষাগ্রহণ করিয়া শিষ্য ঠাকুরঘর হইতে নির্গত হইবামাত্র স্বামী শুদ্ধানন্দ ঐ ঘরে স্বামীজীর নিকটে উপস্থিত হইয়া দীক্ষার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দের[২] আগ্রহাতিশায্য দেখিয়া স্বামীজী তাঁহাকেও দীক্ষাদান করিলেন।

অনন্তর স্বামীজী কতক্ষণ পরে বাহিরা আসিলেন এবং আহারান্তে শয়ন করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শিষ্যও ইতোমধ্যে স্বামী শুদ্ধানন্দের সহিত স্বামীজীর পাত্রাবশেষ সাহ্লাদে গ্রহণ করিয়া আসিয়া তাঁহার পদতলে উপদেশন করিল এবং ধীরে ধীরে তাঁহার পাদসংবাহনে নিযুক্ত হইল।

বিশ্রামান্তে স্বামীজী উপরের বৈঠকখানাঘরে আসিয়া বসিলেন, শিষ্যও এই সময়ে অবসর বুঝিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, পাপপুণ্যের ভাব কোথা হইতে আসিল?

স্বামীজী -- বহুত্বের ভাব থেকেই এই-সব বেরিয়েছে। মানুষ একত্বের দিকে যত এগিয়ে যায়, তত 'আমি-তুমি' ভাব -- যা থেকে এই সব ধর্মাধর্ম-দ্বন্দ্বভাব এসেছে, কমে যায়। 'আমা থেকে অমুক ভিন্ন' -- এই ভাবটা মনে এলে তবে অন্য সব দ্বন্দ্বভাবের বিকাশ হতে থাকে এবং একত্বের সম্পূর্ণ অনুভবে মানুষের আর শুক-মোহ থাকে না -- 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।'[৩]

---

[১] কঠ উপ., ১।২।৫

[২] তখন ব্রহ্মচারী সুধীর

[৩] ঈশোপনিষদ, ৭

যত প্রকার দুর্বলতার অনুভবকেই পাপ বলা যায় -- weakness is sin, এই দুর্বলতার থেকেই হিংসাদ্বেষাদির উন্মেষ হয়। তাই দুর্বলতা বা weakness-এরই নাম পাপ। ভেতরে আত্মা সর্বদা জ্বলজ্বল করছে, সে দিকে না চেয়ে হাড়মাসের কিম্ভুতকিমাকার খাঁচা -- এই জড় শরীরটার দিকেই সবাই নজর দিয়ে 'আমি আমি' করছে! ঐটেই হচ্ছে সকল প্রকার দুর্বলতার গোড়া। ঐ অভ্যাস থেকেই জগতে ব্যবহারিক ভাব বেরিয়েছে। পরমার্থভাব ঐ দ্বন্দ্বের পারে বর্তমান।

শিষ্য -- তাহা হইলে এই-সকল ব্যবহারিক সত্তা কি সত্য নহে?

স্বামীজী -- যতক্ষণ 'আমি'-জ্ঞান আছে, ততক্ষণ সত্য। আর যখনই 'আমি আত্মা' -- এই অনুভব, তখনই এই ব্যবহারিক সত্তা মিথ্যা। লোকে যে 'পাপ পাপ' বলে, সেটা weakness (দুর্বলতা)-এর ফলে -- 'আমি দেহ' এই অহং-ভাবেরই রূপান্তর। যখন 'আমি আত্মা' -- এই ভাব মন নিশ্চল হবে, তখন তুই পাপপুণ্য ধর্মাধর্মের অতীত হয়ে যাবি। ঠাকুর বলতেন: 'আমি' মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।

শিষ্য -- মহাশয়, 'আমি'-টা যে মরিয়াও মরে না! এইটাকে মারা বড় কঠিন।

স্বামীজী -- একভাবে খুব কঠিন, আবার আর এক ভাবে খুব সোজা। 'আমি'-জিনিসটা কোথায় আছে, বুঝিয়ে দিতে পারিস? যে জিনিসটে নেই, তাকে নিয়ে আবার নারানারি কি? আমিত্ব-রূপ একটা মিথ্যা ভাবে মানুষ hypnotised (সম্মোহিত) হয়ে আছে মাত্র। ঐ ভূতটা ছাড়লেই সব স্বপ্ন ভেঙে যায় ও দেখা যায় -- এক আত্মা আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত রয়েছেন। এইটি জানতে হবে, প্রত্যক্ষ করতে হবে। যত কিছু সাধনভজন -- এ আবরণটা কাটাবার জন্য। ওটা গেলেই চিৎ-সূর্য নিজের প্রভায় নিজে জ্বলছে দেখতে পাবি। কারণ আত্মাই একমাত্র স্বয়ংজ্যোতিঃ -- স্বসঘবেদ্য। যে জিনিসটে স্বসংবেদ্য, তাকে অন্য কিছুর সহায়ে কি করে জানতে পারা যাবে? শ্রুতি তাই বলছেন, 'বিজ্ঞাতামরে কেন বিজানীয়াৎ'।[৪] তুই যক্ষা কিছু জানছিস, তা মন-রূপ কারণসহায়ে। মন তো জড়; তার পেছনে শুদ্ধ আত্মা থাকাতেই মনের দ্বারা কার্য হয়। সুতরাং মন দ্বারা সে আত্মাকে কিরূপে জানবি? তবে এইটে মাত্র জানা যায় যে, মন শুদ্ধাত্মার নিকট পৌঁছাতে পারে না, বুদ্ধিটাও পৌঁছাতে পারে না। জানাজানিটা এই পর্যন্ত। তারপর মন যখন বৃত্তিহীন হয়, তখনই মনের লোপ হয় এবং তখনি আত্মা প্রত্যক্ষ হন। ঐ অবস্থাকেই ভাষ্যকার শঙ্কর 'অপরোক্ষানুভূতি বলে বর্ণনা করেছেন।

শিষ্য -- কিন্তু মহাশয়, মনটাই তো 'আমি'। সেই মনটার যদি লোপ হয়, তবে 'আমি'-টাও তো থাকিবে না।

স্বামীজী -- তখন যে অবস্থা, সেটাই যথার্থ 'আমিত্বের স্বরূপ। তখন যে 'আমি'টা থাকবে, সেটা সর্বভূতস্থ, সর্বগ -- সর্বান্তরাত্মা। যেন ঘটাকাশ ভেঙে মহাকাশ -- ঘট ভাঙলে তার ভিতরকার আকাশেরও কি বিনাশ হয় রে? যে ক্ষুদ্র আমিটাকে তুই দেহবদ্ধ মনে করছিলি, সেটাই ছড়িয়ে এইরূপে সর্বগত আমিত্ব বা আত্মারূপে প্রতক্ষ হয়। অতএব মনটা রইল বা গেল, তাতে যথার্থ 'আমি' বা আত্মার কি?

যা বলছি, তা কালে প্রত্যক্ষ হবে -- 'কালেনাত্মনি বিন্দতি'।[৫] শ্রবণ-মনন করতে করতে কালে এই কথা ধারণা হয়ে যাবে, আর মনের পারে চলে যাবি। তখন আর এ প্রশ্ন করবার অবসর থাকবে না।

---

[৪] বৃহদারণ্যকোপনিষদ, ৪।৫।১৫

[৫] গীতা ৪।৩৮

শিষ্য শুনিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। স্বামীজী আস্তে আস্তে ধূম পান করিতে করিতে পুনরায় বলিলেন:

এ সহজ বিষয়টা বুঝাতে কত শাস্ত্রই না লেখা হয়েছে, তবু লোকে তা বুঝতে পারছে না! আপাতমধুর কয়েকটা রূপার চাকতি আর মেয়েমানুষের ক্ষণভঙ্গুর রূপ নিয়ে দুর্লভ মানুষ-জন্মটা কেমন কাটিয়ে দিচ্ছে! মহামায়ার আশ্চর্য প্রভাব! মা! মা!!